ডোকরা শিল্প:—

ডোকরা শিল্পের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। ঐতিহ্যও। ডোকরার নির্মাণ কৌশল আজও অপরিবর্তিত। পুরুষ এই শিল্পের মূল কারিগর। ডোকরা মূর্তির ডিজাইন বানায় পুরুষ। মোম, ধুনো, পিচ দিয়ে বানানো হয় নানা মূর্তির ডিজাইন। সেই ডিজাইন মাটির ছাঁচের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মাটির ছাঁচের জন্য লাগে নানা মাটি। ডিজাইনের উপর মাটির ছাঁচে বেশ কয়েকবার মাটির প্রলেপও দেওয়া হয়। তারপর শুকিয়ে ছাঁচের মুখে ভাঙাচোরা পিতল রেখে, আগুনের ভাটিতে পোড়ান হয়। পরে, ছাঁচের মাটি ছাড়ানো ও পালিশের কাজ চলে। যা পুরুষের কাজ। ছাঁচের মাটি সংগ্রহের কাজটি মহিলার। ডিজাইনের উপর ছাঁচের কাজটিও মহিলাদের। বাঁকুড়া জেলার বিকনা গ্রাম বা পূর্ব বর্ধমান জেলার দরিয়াপুরে এখনও ডোকরার কাজ হয়ে চলেছে। ওরা তৈরী করে দুর্গা, রাবণ, সরস্বতী, গণেশ, কচ্ছপ, লণ্ঠন, আদিবাসী রমণী, নানা প্রাণী, গহনা ইত্যাদি। দামও পায় ওরা। সত্তর টাকা থেকে শুরু করে কোনও কোনও মূর্তির দাম পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। আয় ভালোই হয় ওদের। তাও নুন আনতে পান্তা ফুরাই। আবার গ্রীষ্মকাল এলে পর্যটক আসে কম। তখন মেলা খেলাও কম হয়। তাই আয়ে লাগে ভাটা। পূর্ব বর্ধমানের দরিয়াপুরে যে ১৩০ জন মতো ডোকরা শিল্পী আছে তার মধ্যে ২৪-২৫ জন মহিলা ডিজাইনের কাজটি করতে পারে। মানে, মোম ধুনো ও পিচকে নরম অবস্থায় নানা মূর্তির আকৃতি প্রদান করতে পারে। ডিজাইনের কাজটি সূক্ষ্ম। যা দীর্ঘদিনের অভ্যাসে অর্জন করতে হয়। ওসব মহিলারা সে-কাজটি করে। এদের স্কুলছুট বা স্কুলগামী বাচ্চারাও এ-কাজ শিখে ফেলে বাবামায়ের কাছে। দেখতে দেখতে খেলতে খেলতে। প্রদর্শনী বা মেলা হলে মহিলারা ডোকরা মূর্তি নিয়ে যায়। তাছাড়া সারাবছর ঘরে বসে বিক্রি করে। দরিয়াপুরের এই ছোট্ট মহল্লাতে পর্যটক আসে দেশ-বিদেশ থেকে। জাপান জার্মানি আমেরিকা থেকে। দেশের নানা আর্ট কলেজের শিক্ষানবিশ আসে

ডোকরার কাজ শিখতে। মহিলারাও ওসব শিক্ষানবিশদের শিখেয়ে দেয় মাটির প্রলেপ কতটা দিতে হয়। মোম পিচকে গলনের কোন পর্যায়ে নিয়ে গেলে তা থেকে ডিজাইন করা যাবে অনায়াসে। এসব। তবে এ-কাজের মূল কিন্তু পুরুষ। ডিজাইন, ভাঁটির(আগুন) কাজ, মূর্তি থেকে পোড়া মাটি ছাড়ানো, পালিশ এসব কাজ মূলত পুরুষের। মহিলারাও পিছিয়ে থাকে না। সংসারের কাজের ফাঁকে হাত লাগায় পুরুষের সঙ্গে। আবার রান্নাটা চাপিয়ে একদৌড়ে এসে (পর্যটক এলে) মূর্তি বিক্রি করে। সময় পেলেই ছাঁচের কাজে হাত লাগায়। কেও কেও ডিজাইনও তোলে। সরকার বা নানা সংস্থার তরফে পুরুষরা শিল্পী হিসাবে সম্মান পেয়েছে। পুরস্কার জুটেছে তাদের। স্টেজেও উঠেছে পুরুষ। তাদের বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ মিনা কর্মকার (৪৪), দুর্গা কর্মকার(৫৩), ঝুমা কর্মকার(৩৮), মিনতি কর্মকার(৫৬), শঙ্করী কর্মকাররা (৬১) আজ অবধি শিল্পীর মর্যদা পায়নি। এখানেই যেন চাপা বঞ্চনার একটা সুর শোনা যায় ওদের গলায়। ওরা বলে 'ছেলেরাই সম্মান পায়, ছেলেরাই বাইরে যায়। আমরা ঘরে কাজ করি।' পুরুষদের দেখতে গিয়ে বহু সংস্থার চোখ হয়তো মহিলাদের উপর পরেনি! অন্যদিকে মহিলারা যেন ডোকরা মহল্লার মূল। ওরা না থাকলে পুরুষদের পক্ষে একা এই কাজ তোলা অসম্ভব। মহিলারা ছেলে সামলায়, হেঁশেল সামলায়, বিক্রি বাটা সামলায়, ডিজাইনও তোলে। অথচ এদের দিকে নজর পড়েনা কারো। যাইহোক, দরিয়াপুরের এই শিল্প মহল্লা আজও সামাজিক পরিকামাঠোর কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে পারেনি। ডোকরা শিল্পীরা অশিক্ষিত অথচ ডোকরার কাজে যাচ্ছেতাই পটু। ১০-১২ দিনে একটা বড় দুর্গা মূর্তি হোক বা চার পাঁচ দিনে একটি ছোট্ট সরস্বতী মূর্তিকে এরা হাঁসতে হাঁসতে তৈরী করতে পারে। সুঠাম গঠনশৈলীর কাজে মেয়েদের কোমল হাতের ছাপও স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এরা আজও দরিদ্র। গায়ের কাপড়, বসবাসের স্থান, ঘরের আসবাব, বাড়িঘর দেখেই বোঝা যায় এরা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। আবার শতাব্দী প্রাচীন শিল্পটিকেও ধরে রেখেছে। এসব মহিলার বুকে জমা আছে অনেক আক্ষেপ। তাই যেন ধরা পড়ল শঙ্করী কর্মকারের গলায়— 'আমাদের কে দেখবে বলো! বাইরে থেকে সবাই এসে দেখে যায়। খাতায় লিখে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের তাতে কিছু হয় কি? একটি মূর্তির দাম শুনে সবাই চমকে যায়, কিন্তু খাটনি কি কেও দেখে? দেখো ঘর বাড়ির কি হাল! আমাদের অন্য কাজ নাই। জমি নাই। আমরাই ডোকরাকে বাঁচিয়ে রাখছি। আমাদের বাঁচিয়ে রাখে কে?' অশিক্ষিত এই মহিলা শিল্পীর কথা যে কোনও শিক্ষিত মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবে। শিল্পীদের বোধশক্তি প্রখর হয়, তার জন্য পড়াশোনা না করলেও চলে। এরা কেবল প্রাপ্য মর্যদাটুকু পেলেই খুশি হয়। কিন্তু এসব মহিলা শিল্পীদলকে সে সম্মান দেবে কে? ডোকরার ছাঁচের পোড়া মাটিকে যেমন মূর্তি তৈরীর শেষে ফেলে দেওয়া হয় দূরে, তেমনই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের অবস্থাও যেন তাই, আমাদের কাছে।